প্রয়োজন যথাযথ তথ্য অধিকার আইন

ড. বদিউল আলম মজুমদার, সুজন-সুশাসনের জন্য নাগরিক (২১ মার্চ, ২০০৮)

তথ্য মন্ত্রণালয় সম্প্রতি নাগরিকদের তথ্য প্রাপ্তির অধিকার নিশ্চিত করার লক্ষ্যে একটি অধ্যাদেশের খসড়া প্রণয়ন করে জনমত গ্রহণের উদ্যোগ নিয়েছে, যা নিঃসন্দেহে একটি দৃষ্টান্ত সৃষ্টিকারী পদক্ষেপ। খসড়াটিতে ২৭টি ধারা রয়েছে এবং এগুলোকে মোটাদাগে ছয়টি ভাগে বিভাজন করা যেতে পারে: (১) অধ্যাদেশের উদ্দেশ্য, ব্যাপ্তি ও পরিধি; (২) কর্তৃপক্ষের তথ্য প্রকাশের প্রক্রিয়া; (৩) তথ্য চাওয়া ও পাওয়া এবং প্রদানের পদ্ধতি; (৪) তথ্য প্রকাশ থেকে অব্যহতি; (৫) তথ্য কমিশন গঠন ও আপিলের পদ্ধতি; এবং (৬) তথ্য প্রদানের অস্বীকৃতির জন্য শাস্তির বিধান। উদ্যোগটির, বিশেষত খসড়াটির ওপর জনমত গ্রহণের প্রচেষ্টার জন্য মন্ত্রণালয় প্রশংসিত হলেও, অনেকে তীব্রভাবে খসড়াটির সমালোচনা করেছেন। কেউ কেউ এটিকে তথ্য অধিকার প্রতিষ্ঠিত করার পরিবর্তে তথ্য প্রদানে বাধা সৃষ্টি করার প্রস্তাবিত আইন বলে আখ্যায়িত করেছেন।

তথ্য অধিকার আইন প্রণয়নের দার্শনিক ভিত্তি ও যথার্থ উদ্দেশ্য তথ্য প্রদান বা তথ্য উন্মুক্তকরণকে – কিছু সুস্পষ্ট ও সুনির্দিষ্ট ব্যতিক্রম ছাড়া – 'রুল' বা নিয়মে পরিণত করা। তথ্য গোপনের সংস্কৃতির রূপান্তর ঘটানোর লক্ষ্যে তথ্য প্রবাহ উন্মুক্তকরণের ও প্রদানের প্রতিবন্ধকতা দূর করা। আরো সুস্পষ্টভাবে বলতে গেলে, এর লক্ষ্য হওয়া উচিত: (ক) নাগরিকদের বাক স্বাধীনতা কার্যকর করা, (খ) তাদের ক্ষমতায়ন করা, এবং (খ) কর্তৃপক্ষের, বিশেষত সরকারি কর্তৃপক্ষের স্বচ্ছতা-জবাবদিহিতা নিশ্চিত করে দুর্নীতি ও দুর্বৃত্তায়ন রোধ করা। এ উদ্দেশ্য ও লক্ষ্যগুলোর আলোকেই প্রস্তাবিত খসড়াটির মূল্যায়ন করা প্রয়োজন।

***

পণ্ডিতদের মতে 'তথা' শব্দ থেকে 'তথ্য' শব্দের উৎপত্তি। অর্থাৎ তথা মানে 'যা তা-ই' বা 'যেমনটা তেমনই'। অন্যভাবে বলতে গেলে, যা সত্য তা-ই তথ্য – সত্যই তথ্য। আর এ সত্য জানার অধিকার নাগরিকদের বাক স্বাধীনতাকে 'মিনিংফুল' বা অর্থবহ করে তোলে – বস্তুত তথ্য ছাড়া মত প্রকাশের মৌলিক অধিকার কার্যকর ভূমিকা রাখতে পারে না। ভারতীয় সুপ্রিম কোর্ট তথ্য জানার অধিকার, বিশেষত প্রার্থীদের সম্পর্কে ভোটারদের জানার অধিকারকে মত প্রকাশের মৌলিক অধিকার হিসেবে স্বীকৃতি দিয়েছেন, কারণ ভোটারগণ মত প্রকাশ করেন ভোটের মাধ্যমে।

তথ্য প্রাপ্তির মাধ্যমে বাক বা মত প্রকাশের স্বাধীনতা কার্যকর হলেই জনগণ, রাষ্ট্রের মালিক হিসেবে, শাসনকার্য পরিচালনার ক্ষেত্রে কার্যকরভাবে অংশগ্রহণ করতে পারে, ফলে নিতান্তই নির্বাচনকেন্দ্রিক প্রতিনিধিত্বশীল সরকারের পরিবর্তে অংশগ্রহণমূলক শাসন ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পথ সুগম হয়। রাষ্ট্র পরিচালনায় জনগণের মতামত প্রতিফলিত হওয়ার সুযোগ সৃষ্টি হয়। আর তথ্যপ্রাপ্ত সচেতন নাগরিকই গণতন্ত্রের রক্ষাকবচ।

আমাদের সংবিধানের ৭ অনুচ্ছেদে জনগণকে সকল ক্ষমতার মালিক বলে স্বীকৃতি প্রদান করা হয়েছে। কিন্তু ঐতিহাসিকভাবে নানা উপায়ে তাদেরকে ক্ষমতাহীন করা হয়েছে – ক্ষমতাসীনদের কাছে এখন তারা মূলত ভেড়ার পাল হিসেবে বিবেচিত। জনগণকে ক্ষমতাহীন করার একটি প্রক্রিয়া হলো তাদেরকে তথ্য থেকে বঞ্চিত করা, কারণ বর্তমান বিশ্বে ইনফরমেশনই পাওয়ার বা তথ্যই ক্ষমতা। তথ্য পেলে নিঃসন্দেহে জনগণ ক্ষমতায়িত হয় এবং তারা আত্মনিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠার সুযোগ পায়। ক্ষমতাসীনদের ক্ষমতার অপব্যবহার রোধ করার সক্ষমতা তারা অর্জন করতে পারে। মহাত্মা গান্ধীর মতে, æThe real Swaraj will come not by the acquisition of authority by a few but by the acquisition of capacity by all to resist authority when abused." (সত্যিকারের স্বরাজ বা আত্মনিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠিত হবে না কতিপয় ব্যক্তির কাছে ক্ষমতা কেন্দ্রীভূত হওয়ার মাধ্যমে, তা প্রতিষ্ঠিত হবে ক্ষমতার অপব্যবহারের প্রচেষ্টাকে প্রতিহত করার সকলের সক্ষমতা অর্জিত হলে।)

এছাড়াও তথ্যের ভিত্তি সত্য হওয়ার কারণে তথ্য অন্ধকার দূর করে আলোর বিচ্ছুরণ ঘটায়। দিনের আলো যেমন চৌর্যবৃত্তিতে লিপ্তদেরকে তাদের দুষ্কর্ম থেকে বিরত রাখে, তেমনি অবাধ তথ্য প্রবাহের দ্বারা আলোকিত সমাজে স্বচ্ছতা-জবাবদিহিতা প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পথ প্রশস্ত হয় এবং দুর্নীতি প্রবলভাবে বাধাগ্রস্ত হয়। এ কারণেই বলা হয় – সুর্যের আলোই সর্বাধিক কার্যকর জীবানুনাশক।

প্রস্তাবিত খসড়া আইনের মুখবন্ধে তথ্য জানার অধিকারকে সাংবিধানিক অধিকার হিসেবে স্বীকৃতি দেয়া হয়েছে এবং নাগরিকের ক্ষমতায়নের প্রয়োজনীয়তার কথা বলা হয়েছে। একইসাথে তথ্য অধিকার প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে সকল সরকারি ও বেসরকারি প্রতিষ্ঠানে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা প্রতিষ্ঠার আকাঙ্ক্ষা ব্যক্ত করা হয়েছে। কিন্তু খসড়াটিতে তথ্যপ্রাপ্তির অধিকারকে মৌলিক অধিকার হিসেবে স্বীকৃতি দেয়া হয় নি। আর নাগরিকের ক্ষমতায়নের বিষয়টিও অত্যন্ত দুর্বলভাবে উপস্থাপিত হয়েছে। সর্বোপরি খসড়াটিতে তথ্য প্রদান বা উন্মুক্তকরণকে, কিছু সুনির্দিষ্ট বিধি-নিষেধ সাপেক্ষে, (একসেপশন বা ব্যাতিক্রমের পরিবর্তে) রুল বা নিয়মে পরিণত করার প্রত্যয় ব্যক্ত করা হয় নি। বরং জনগণের তথ্য জানার অধিকারকে 'রাষ্ট্রীয় নিরাপত্তা', 'রাষ্ট্রীয় সম্মান' এবং 'জনস্বার্থে'র অস্পষ্ট ও অসংজ্ঞায়িত মানদণ্ডের মুখোমুখি দাঁড় করানো হয়েছে। তাই প্রস্তাবিত খসড়াটিতে একদিকে তথ্য প্রবাহের কথা বলা হয়েছে, আরেকদিকে তথ্য গোপনের যুক্তি খাঁড়া করানো হয়েছে। এমতাবস্থায়, প্রস্তাবিত খসড়াটির মুখবন্ধ পুনঃলিখন প্রয়োজন। পুনঃলিখন প্রক্রিয়ার প্রথম দু'টি লাইন (তথ্য জানার স্পৃহা মানুষের সহজাত প্রবৃত্তি। তথ্য জানার আগ্রহ ক্রমান্বয়ে তথ্য অধিকারে পরিণত হইয়াছে।) বাদ দেয়া আবশ্যক। কারণ লাইন দু'টি তথ্যের অধিকারকে মৌলিক অধিকার হিসেবে স্বীকৃতি না দিয়ে আইনের পুরো উদ্দেশ্যকেই হালকা, অস্পষ্ট ও ধোঁয়াটে করে ফেলেছে বলে আমাদের ধারণা।

***

প্রস্তাবিত খসড়াটি কি অবাধ তথ্য প্রবাহ নিশ্চিত করবে? তা হবে, যদি তথ্য সহজপ্রাপ্য ও সহজলভ্য হয় এবং তথ্যগুলো সময়মতো পাওয়া যায়। এক্ষেত্রে প্রস্তাবিত খসড়ায় অনেকগুলো পর্বতপ্রমাণ বাধা সৃষ্টি করা হয়েছে। আমাদের আশংকা যে, খসড়ার অব্যাহতির তালিকার ধারা ৮(ক) ও (ঝ) তথ্য প্রদানের ক্ষেত্রে অনতিক্রম্য বাধা হয়ে দাঁড়াতে পারে। ধারা ৮(ক)-এ, 'রাষ্ট্রীয় নিরাপত্তা, সার্বভৌমত্ব, সম্মান, পররাষ্ট্রনীতি, প্রতিরক্ষা অথবা কোন বিদেশী রাষ্ট্রের বা সংস্থার সাথে বিদ্যমান সম্পর্ক ক্ষুন্ন হইবার আশংকা থাকে' এমন তথ্য প্রকাশ নিষিদ্ধ করা হয়েছে। ধারা ৮(ঝ) অনুযায়ী 'জনস্বার্থের পরিপন্থি' এ বিবেচনায় তথ্য প্রদান নিষিদ্ধ করা যেতে পারে। 'রাষ্ট্রীয় নিরাপত্তা' ও 'জনস্বার্থ' এ দু'টি বিষয়ের আবরণে প্রায় সব তথ্য আচ্ছাদন করে রেখে সেগুলো গোপন রাখা সম্ভব। এছাড়াও রাষ্ট্রীয় নিরাপত্তার যুক্তি উত্থাপন করলে দেশপ্রেমিক নাগরিকের পক্ষে এ ব্যাপারে প্রশ্ন তোলা দুরূহ হয়ে পড়ে। প্রসঙ্গত, এ ধরনের আইনের ফলে 'সোফা' বা 'হানা'র মতো চুক্তি সম্পর্কে রাষ্ট্রের মালিকদের জানার অধিকার থাকবে না।

আমাদের গোপনীয়তার সংস্কৃতিতে রাষ্ট্রীয় নিরাপত্তার যুক্তিটির অপব্যবহার অহরহ হয়ে থাকে। এ ব্যাপারে সংবিধান লঙ্ঘন করতেও অতীতের সরকারগুলো দ্বিধা করে নি। যেমন কোন বৈদেশিক চুক্তিই আমাদের সংসদে উত্থাপিত হয় না, যদিও এ ব্যাপারে, এমনকি গোপনীয় চুক্তির ক্ষেত্রেও তা করার বাধ্যবাধকতা রয়েছে। আমাদের সংবিধানের ১৪৫(ক) অনুযায়ী, "বিদেশের সহিত সম্পাদিত সকল চুক্তি রাষ্ট্রপতির নিকট পেশ করা হইবে, এবং রাষ্ট্রপতি তাহা সংসদে পেশ করিবার ব্যবস্থা করিবেন: তবে শর্ত থাকে যে জাতীয় নিরাপত্তার সহিত সংশ্লিষ্ট অনুরূপ কোন চুক্তি কেবলমাত্র সংসদের গোপন বৈঠকে পেশ করা হইবে।" তাই রাষ্ট্রীয় নিরাপত্তার নামে বৈদেশিক নীতি সম্পর্কিত চুক্তির বিষয়গুলো গোপন রাখা সংবিধানের পরিপন্থি। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত গোপনীয়তার সংস্কৃতির কারণে অতীতের কোন সরকারই সংবিধানের এ সুস্পষ্ট নির্দেশনা মেনে চলে নি।

এছাড়াও পররাষ্ট্রনীতি ও বৈদেশিক চুক্তি কেন গোপন হবে? এক্ষেত্রে ভারতীয় দৃষ্টান্ত অনুসরণ করা যেতে পারে। ভারতে যে সকল তথ্য সংসদে প্রকাশ করা বাধ্যতামূলক, সেগুলো জনসাধারণের জন্য উন্মুক্ত করতে হয়। বৈদেশিক কোম্পানির সাথে জনগণের সম্পদের ব্যবহার, আহরণ ও উৎকর্ষ সাধনের লক্ষ্যে সরকারি চুক্তিও তথ্য অধিকার আইনের আওতায় আনা যুক্তিযুক্ত হবে। তা হলেই নাইকো ও এশিয়া এনার্জির মতো বহুজাতিক কোম্পানীর সাথে সরকারি চুক্তিগুলি জনগণের কাছে উন্মুক্ত হওয়ার সুযোগ সৃষ্টি হবে।

প্রস্তাবিত খসড়ার ৮(ক) তে রাষ্ট্রীয় 'সম্মানের' কথা বলা হয়েছে। কিন্তু রাষ্ট্রীয় সম্মানের সংজ্ঞা কী? রাষ্ট্রের মালিকগণের সত্য, এমনকি অপ্রিয় সত্য জানার সাথে রাষ্ট্রের সম্মানের কী যোগসূত্রতা থাকতে পারে? এছাড়াও রাষ্ট্রের সম্মান কোন ঠুনকো জিনিস নয়। তথ্য দ্বারা ব্যক্তির ভাবমূর্তি নষ্ট হতে পারে, কিন্তু এর দ্বারা রাষ্ট্র হেয় প্রতিপন্ন হওয়ার প্রশ্নই আসে না। রাষ্ট্রীয় কোন কর্তৃপক্ষের প্রকাশিত তথ্য সে কর্তৃপক্ষের মর্যাদাহানি ঘটালেও তা কোনভাবেই রাষ্ট্রকে খারাপভাবে চিত্রায়িত করবে না। আর লজ্জাস্কর কোন তথ্য থাকলে তা দ্রুততার সাথে প্রকাশ করে অবস্থার বিহীত করাই কাম্য।

আমরা মনে করি যে, জনস্বার্থের ধারাটি বাতিল হওয়া উচিত। একইসাথে রাষ্ট্রীয় 'সম্মান' নামক বায়বীয় বিষয়টিও চূড়ান্ত আইন থেকে বাদ দেয়া প্রয়োজন। আরো প্রয়োজন তথ্য প্রদান থেকে অব্যাহতির তালিকাটিকে আরো সুনির্দিষ্ট, সুস্পষ্ট ও সংকুচিত করা।

রাষ্ট্রীয় নিরাপত্তার বিষয়টি গুরুত্বপূর্ণ এবং এটি তথ্যপ্রবাহ অবাধ করার ক্ষেত্রে একটি 'নেছেছারি ইভিল' বা অনাকাঙ্ক্ষিত কিন্তু প্রয়োজনীয় প্রতিবন্ধকতা। তবে এ ব্যাপারেও সাবধানতা অবলম্বন এবং রাষ্ট্রীয় নিরাপত্তার সংজ্ঞাটি সংকুচিত করতে হবে। রাষ্ট্রীয় নিরাপত্তাকে 'হলি কাউ' বা ধরা ছোঁয়ার বাইরে এমন বিষয় হিসেবে গণ্য করা ঠিক হবে না। সামরিক বাহিনীর কিছু বিষয়ে স্বচ্ছতা-জবাবদিহিতা অবশ্যই নিশ্চিত হওয়া গুরুত্বপূর্ণ। যেমন, আমাদের সামরিক বাহিনীর জাতীয় নিরাপত্তা সংক্রান্ত কার্যক্রম – কোথায় কত সেনাবাহিনী এবং কত ও কী ধরনের সমরাস্ত্র মোতায়েন করা হয়েছে – তা নিঃসন্দেহে জাতীয় নিরাপত্তার জন্য গুরুত্বপূর্ণ এবং এগুলোর গোপনীয়তা রক্ষা করা আবশ্যক। তবে ডিফেন্স পার্চেজ বা সামরিক ক্রয় সম্পর্কিত তথ্য, যার সাথে দুর্নীতি যুক্ত থাকতে পারে – কোনভাবেই গোপনীয় হতে পারে না। যেমন, কেন আমরা রাশিয়ান মিগ বিমান কিনলাম, কেন ব্রিটিশ হেরিয়ার কিনলাম না – তা জানার অধিকার নাগরিকদের রয়েছে। এছাড়াও স্বচ্ছতার খাতিরে কারা এসকল কেনাকাটার চুক্তির পেছনে আছে, অর্থাৎ কারা ঠিকাদার তা প্রকাশ করাও গুরুত্বপূর্ণ।

তথ্য প্রবাহ অবাধ করে জনগণকে, বিশেষত পিছিয়ে পড়া জনগণকে ক্ষমতায়িত করতে হলে তথ্য প্রাপ্তি সহজলভ্য করতে হবে। ভারতে দারিদ্র্যসীমার নিচে বসবাসকারী ব্যক্তিদের তথ্য প্রাপ্তির জন্য কোন ফি দিতে হয় না। কিন্তু আমাদের প্রস্তাবিত আইনে এ ধরনের কোন বিধান রাখা হয় নি এবং বিষয়টি বিবেচনার দাবি রাখে। তবে এ সুযোগের অপব্যবহার যেন না হয় সেদিকে লক্ষ্য রাখতে হবে। এছাড়াও তথ্যপ্রাপ্তির দরখাস্তের ছকে আবেদনের কোন কারণ প্রদর্শনের বাধ্যবাধকতা সৃষ্টি করা অযৌক্তিক হবে।

তথ্যপ্রবাহ অবাধ করতে হলে সকল কর্তৃপক্ষকে স্বপ্রণোদিত হয়ে তথ্য প্রদানে এগিয়ে আসতে হবে। এজন্য অবশ্য গোপনীয়তার সংস্কৃতির পরিবর্তন করার প্রয়োজন হবে। আরো প্রয়োজন হবে পদ্ধতিগতভাবে সকল তথ্য সংরক্ষণ এবং ক্রমাগতভাবে ও অব্যাহতগতিতে এগুলোর প্রকাশ। কম্পিউটার ব্যবহার করে, আধুনিক তথ্য প্রযুক্তিকে কাজে লাগিয়ে তা করা সম্ভব। এজন্য অবশ্য প্রয়োজন হবে ই-গভর্নেন্স ব্যবস্থার প্রচলন। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত প্রস্তাবিত খসড়াটিতে এ ধরনের কোন দৃঢ় প্রত্যয় ব্যক্ত করা হয় নি। পক্ষান্তরে প্রত্যেক সরকারি কর্তৃপক্ষকে প্রতি দুই বছরে তার সাংগঠনিক বিবরণ, কার্যক্রম, কর্মকর্তা-কর্মচারিদের দায়িত্বাবলী এবং সিদ্ধান্তগ্রহণ প্রক্রিয়ার বিবরণ; তাদের ব্যবহৃত নিয়মকানুন ইত্যাদি ও সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়া; কর্তৃপক্ষের রক্ষিত রেকর্ডসমূহের শ্রেণীবিন্যাস; এবং দায়িত্বপ্রাপ্ত তথ্য প্রদানকারী কর্মকর্তার নাম

পদবী ও ঠিকানা সম্বলিত একটি প্রতিবেদন প্রকাশের বিধান করা হয়েছে (ধারা-৫)। লক্ষণীয় যে, এখানে 'ভলান্টারি ম্যাক্সিমাম ডিসক্লোজারস' বা স্বপ্রণোদিত হয়ে সর্বাধিক তথ্য প্রকাশের কোন বিধান বা বাধ্যবাধকতা নেই। এছাড়াও প্রতি দুই বছরে একটি প্রতিবেদন প্রকাশ করার বিধান কোনভাবেই গ্রহণযোগ্য নয় – তথ্য উন্মুক্তকরণ প্রক্রিয়া হতে হবে অব্যাহত। ফলে বর্তমান খসড়াটি আইনে পরিণত হলে তথ্য গোপনের সংস্কৃতির পরিবর্তে স্বেচ্ছায় তথ্য প্রকাশের সংস্কৃতির প্রবর্তন হবে বলে আশা করা যায় না।

উল্লেখ্য যে, প্রস্তাবিত খসড়াটিতে কর্তৃপক্ষের তথ্য প্রদানে অসম্মতির সিদ্ধান্ত কারণসহ ২০ দিনের মধ্যে আবেদনকারীকে অবহিত করার বিধান করা হয়েছে (ধারা ৬(ঘ)), যার ফলে কর্তৃপক্ষ তথ্যপ্রদানের জন্য ২০ দিন পর্যন্ত সময় নিতে পারবে। অনেকের, বিশেষত গণমাধ্যমের জন্য এ ধরনের বিলম্ব ঘটলে তথ্য পাওয়ার প্রয়োজনীয়তাই আর থাকবে না। তাই গণমাধ্যমের জন্য এবং বিশেষ প্রয়োজনে (যেমন, জীবন-মৃত্যুর সাথে জড়িত কারণে) তাৎক্ষণিক তথ্য প্রদানের বিধান করতে হবে। এ জন্য অবশ্য প্রয়োজন হবে সকল রেকর্ডের দ্রুততম সময়ের মধ্যে কম্পিউটারে সংরক্ষণ এবং ই-গভর্নেন্সের প্রচলন।

অবাধ তথ্য প্রবাহ নিশ্চিত করার ক্ষেত্রে একটি বড় বাধা হলো কতগুলো বিদ্যমান আইন – যেমন, অফিসিয়াল সিক্রেটস্ অ্যক্ট (ধারা ৫-১), সাক্ষ্য আইন (ধারা ১২২ ও ১২৪), রুলস অব বিজনেস, গভর্মেন্ট সার্ভেন্টস কনডাক্ট রুলস (ধারা ১৯), দি প্রিন্টিং প্রেসেস এন্ড পাবলিকেশনস (ডিক্লারেশন এন্ড রেজিস্ট্রেশন) অ্যাক্ট, ফৌজদারি কার্যবিধি ইত্যাদি। এছাড়াও সংবিধানে গোপনীয়তা রক্ষার শপথ অন্তর্ভুক্ত। আদালত অবমাননা আইন ও সংসদীয় কার্যপ্রণালী তথ্য প্রবাহ অবাধ করার ক্ষেত্রে প্রতিবন্ধকতার সৃষ্টি করে। তথ্য অধিকার আইনের সুফল পেতে হলে এ সকল আইন ও বিধানগুলোর জরুরিভিত্তিতে মূল্যায়ন এবং প্রয়োজনীয় সংশোধন আবশ্যক। গোপনীয়তার সংস্কৃতি রূপান্তর করতে হলে অফিসাল সিক্রেটস্ অ্যাক্টের সংশোধনের কোন বিকল্প নেই।

প্রস্তাবিত খসড়াটির একটি বড় সমস্যা হলো এর স্কোপ বা পরিধি। এর আওতায় সকল সরকারি ও বেসরকারি – স্বেচ্ছাসেবী এবং ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠানকে আনা হয়েছে – এটি যেন এক ঢিল মেরে সকল দানবকে খতম করার প্রচেষ্টা! অন্যান্য দেশের আইনগুলোতে মূলত সরকারি কর্তৃপক্ষকে – প্রশাসন, আইন পরিষদ ও বিচার বিভাগকে – তথ্য অধিকার আইনের আওতায় আনা হয়েছে। সরকারের কাছে যে সকল তথ্য রয়েছে বা প্রদান করা হয়েছে, সেগুলো নাগরিকের সংবিধানস্বীকৃত (অনুচ্ছেদ ৪৩) 'রাইট টু প্রাইভেসি' রক্ষার্থে কিছু ব্যতিক্রম ছাড়া (উদাহরণস্বরূপ, আয়কর রিটার্ন) প্রকাশ করার বাধ্যবাধকতার সৃষ্টি করা হয়েছে। যেমন, ভারতীয় আইনে সরকারি প্রতিষ্ঠানের সাথে বেসরকারি ও অন্যান্য প্রতিষ্ঠানকে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে যেগুলো সরকারের মালিকানা কিংবা নিয়ন্ত্রণাধীন কিংবা যেগুলোর অর্থায়নের সম্পূর্ণ বা গুরুত্বপূর্ণ অংশ প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে সরকারি কোষাগার থেকে আসে। ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠানগুলোকে ভারতীয় *রাইট টু ইনফরমেশন অ্যক্ট, ২০০৫*-এর আওতামুক্ত রাখা হয়েছে। অনেকের ধারণা প্রস্তাবিত খসড়াটির পরিধি এত বিস্তৃত করে এটিকে লক্ষ্যচ্যুত করা হয়েছে। উল্লেখ্য যে, প্রস্তাবিত আইনের পরিধি ব্যাপকভাবে বিস্তৃত করা হলেও, রাজনৈতিক দলগুলোকে এর আওতায় আনা হয় নি। পার্লামেন্ট এবং বিচারবিভাগের তথ্য প্রদানের বাধ্যবাধকতা সম্পর্কে প্রস্তাবিত খসড়ায় সুস্পষ্টভাবে কিছু বলা হয় নি। নির্বাচনে প্রার্থীদের সম্পর্কে ভোটারদের তথ্যপ্রাপ্তির অধিকার সম্পর্কেও প্রস্তাবিত খসড়াটি সম্পূর্ণ নিশ্চুপ। উল্লেখ্য যে, সরকারের সংগৃহীত ও কোন সরকারি কর্তৃপক্ষের কাছে সংরক্ষিত তথ্যগুলো কিছু সুস্পষ্ট বিধি-নিষেধ ছাড়া তথ্য অধিকার আইনের আওতায় আনা হলে, সকল তদন্ত কমিশনের রিপোর্ট প্রকাশের বাধ্যবাধকতা সৃষ্টি হবে।

তথ্য অধিকার আইনকে সরকারি কর্তৃপক্ষের কাছে সংরক্ষিত কিংবা সরকারি কোষাগারের অর্থপুষ্ট প্রতিষ্ঠানের তথ্য প্রদানের ক্ষেত্রে সীমাবদ্ধ করার যৌক্তিকতা হলো যে, তথ্য প্রবাহ অবাধ করার লক্ষ্যে একটি আইনকে 'সিলভার বুলেট' হিসেবে ব্যবহারের বা একমাত্র সমাধান হিসেবে দেখার কোন অবকাশ নেই। এ জন্য প্রয়োজন অনেকগুলো আইনের – 'এ ফ্যামিলি অব ল'জ'। যেমন, বেসরকারি স্বেচ্ছসেবী সংস্থার জন্য সুনির্দিষ্ট আইন ও আইনটি প্রয়োগের জন্য কয়েকটি কর্তৃপক্ষ রয়েছে। তেমনিভাবে ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠানগুলোর জন্যও ভিন্ন আইন ও কর্তৃপক্ষ রয়েছে। নির্বাচনের ক্ষেত্রেও সুনির্দিষ্ট আইন ও কর্তৃপক্ষ রয়েছে। এ সকল আইনে কর্তৃপক্ষের কাছে তথ্য প্রদানের বিধান রয়েছে। অনেকের মতে, সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের কাছে এ সকল প্রতিষ্ঠানের প্রদত্ত তথ্যগুলো প্রকাশের বিধান তথ্য অধিকার আইনের অন্তর্ভুক্ত হওয়া প্রয়োজন। আরো প্রয়োজন সংশ্লিষ্ট আইনের তথ্য প্রদানের বিধি-বিধানগুলোকে আরো কঠোর ও সুস্পষ্ট করা। দৈনিক সংবাদের একটি সাম্প্রতিক সম্পাদকীয় (১৩ মার্চ, ২০০৮) এক্ষেত্রে প্রণিধানযোগ্য। সম্পাদকীয়টিতে প্রস্তাবিত খসড়াটি সম্পর্কে বলা হয়েছে:

> "এ আইন প্রণয়ণের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য হওয়া উচিত সরকারি কর্তৃপক্ষের (পাবলিক অথোরিটি) প্রতিদিনের কাজে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে জনগণের তথ্য জানার অধিকার প্রতিষ্ঠা করা। জনগণের তথ্য জানা বা পাওয়ার অধিকারটি মৌলিক অধিকারের পর্যায়ে পড়ে। এবং জনগণ চাইলে সরকারি কর্তৃপক্ষ অথবা সরকারি মন্ত্রণালয়, বিভাগ, দপ্তর এবং সাংবিধানিকভাবে গঠিত, সংসদের আইন দ্বারা গঠিত সরকার বা উপযুক্ত কর্তৃপক্ষ দ্বারা গঠিত কর্তৃপক্ষ, সংস্থা অথবা প্রতিষ্ঠানের কাছ থেকে তথ্য পেতে পারে সে লক্ষ্যেই প্রণীত হবে তথ্য অধিকার আইন। শুধু তাই নয়, চুক্তি অথবা অন্য কোনভাবে সরকারের পক্ষে কার্যরত কোন সংস্থা, মানবাধিকার সুরক্ষা ও জনগণের মঙ্গলের সঙ্গে সম্পর্কিত তথ্য বিষয়ে কাজ করছে এমন সব বেসরকারি সংস্থার কাছ থেকেও যেন জনগণ তথ্য পেতে পারে তার অধিকার প্রতিষ্ঠার জন্য তথ্য অধিকার আইন প্রণীত হবে। তথ্য অধিকার আইনের কয়েকটি সুনির্দিষ্ট বৈশিষ্ট্য থাকতে হবে, সেগুলো হচ্ছে: সরকারি কর্তৃপক্ষের অর্থাৎ যেখানে জনগণের অর্থ ব্যয় হয়, যেখানে জনগণের অর্থে নিয়োজিত কর্মকর্তা-কর্মচারীরা কাজ করেন এবং জনগণের ভোটে নির্বাচিত প্রতিনিধি রয়েছেন সেসব কর্তৃপক্ষ বা সংস্থার স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে জনগণকে তথ্য দিতে হবে। ... ব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠান বা বেসরকারি সংস্থাগুলোকে নিয়ন্ত্রণ করা বা তাদের সম্পর্কে জানা বা বুঝার জন্য বহু সরকারি দপ্তর বা বিভাগ রয়েছে । প্রয়োজন হলে জনগণ সেখান থেকেই এদের সম্পর্কে তথ্য জানতে পারবে। এই দপ্তরগুলোকে আরো কার্যকর করতে হবে। সেটা না করে বেসরকারি ব্যবসায়ী

প্রতিষ্ঠানকে এ আইনের আওতায় আনার উদ্দেশ্যটি আমাদের কাছে মহৎ বলে মনে হচ্ছে না। এই প্রতিষ্ঠানগুলোকে তথ্য অধিকার আইনের আওতায় আনার অর্থ হচ্ছে এদের বিরুদ্ধে জনগণকে লেলিয়ে দেয়া। এবং তথ্য জানার অধিকারটি সরকারি কর্তৃপক্ষ বা সরকারি দপ্তর বিভাগ অথবা জনপ্রতিনিধিদের কাছ থেকে, যেখানে জনগণের অর্থ ব্যয় হচ্ছে সেখান থেকে লক্ষ্যচ্যুত করা। একজন ব্যবসায়ী তো সরকার বা জনগণের অর্থ ব্যয় করছেন না। তিনি কেন তার ব্যবসার তথ্য জনগণকে জানাতে বাধ্য থাকবেন?"

প্রস্তাবিত খসড়ায় অন্তর্ভুক্ত তথ্য কমিশনের সদস্য সংখ্যা, নিয়োগ পদ্ধতি ও আপিলের বিধান সম্পর্কেও অনেকে প্রশ্ন তুলেছেন। অনেকের মতে, কমিশনের সদস্য সংখ্যা তিনে সীমাবদ্ধ রাখা সমীচিন হবে না। এছাড়াও তথ্য প্রদানে অসম্মতির ক্ষেত্রে সংক্ষুব্ধ ব্যক্তির ওপর আপিলের দায় বর্তানো হয়েছে। অনেকের আশংকা যে, এর ফলে সমাজে পিছিয়ে পড়া অথবা প্রত্যন্ত অঞ্চলে বসবাসকারী নাগরিকদের পক্ষে আপিলের বিধানটির সুযোগ নেয়া সম্ভব হবে না। তাই তথ্য প্রদানে অস্বীকৃতি জানিয়েছে এমন কর্তৃপক্ষের ওপরই তথ্য কমিশনের কাছে যাওয়ার বিধান হওয়া যুক্তিযুক্ত বলে অনেকের ধারণা। প্রসঙ্গত, তথ্য কমিশনকে অবশ্যই তথ্য উন্মুক্তকরণের প্রবক্তা হতে হবে এবং এ ব্যাপারে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষকে সহযোগিতা দিতে হবে। এ লক্ষ্যে কমিশনের সকল সিদ্ধান্তের 'গাইডিং প্রিন্সিপাল' হওয়া উচিত – তথ্য প্রকাশের ফলে যে ক্ষতি হবে তার চেয়ে উপকার যদি বেশি হয়, তাহলে সে তথ্য প্রকাশ করতে হবে।

এছাড়াও তথ্য কমিশনের কাছে আপিল নিয়ে যাওয়ার আগে আরকেটি পদক্ষেপ থাকা উচিত বলে অনেকে মনে করেন। এলক্ষ্যে 'আরবিট্রেশনে'র একটি বিধান আইনে সন্নিবেশিত করা যেতে পারে। কর্তৃপক্ষের নিজেদের প্রতিনিধি এবং নাগরিক ও পেশাজীবিদের সমন্বয়ে গঠিত একটি 'আরবিট্রেশন কাউন্সিল' প্রত্যেক প্রতিষ্ঠানে সৃষ্টি করা যেতে পারে। তা না হলে আপিলের সংখ্যার আধিক্যের কারণে দীর্ঘসূত্রীতার সৃষ্টি এবং কমিশনের কার্যকারিতা ব্যাহত হতে পারে।

প্রস্তাবিত খসড়ার দায়মুক্তির ধারাটি (ধারা-১১) নতুন করে লেখা আবশ্যক। তথ্য অধিকার আইনের দায়মুক্তির ধারা অন্তর্ভুক্ত করার উদ্দেশ্য সাধারণত 'হুইসেল ব্লোয়ার'দের – যারা বৃহত্তর স্বার্থে ও বিবেকের তাড়নায় প্রচলিত আইন, নিয়ম ও পদ্ধতি ভঙ্গ করে কোন কর্তৃপক্ষের অন্যায় কার্যক্রমের তথ্য প্রকাশ করেন – তাদেরকে রক্ষা বা নিরাপত্তা নিশ্চিত করা। কিন্তু প্রস্তাবিত আইনে ঢালাওভাবে সরল বিশ্বাসে কৃত সকল কর্মের জন্য দায়মুক্তির বিধান রাখা হয়েছে, যা আইনটিকে নিতান্তই কাগুজে বাঘে পরিণত করতে পারে বলে আমাদের আশংকা।

***

তথ্য অধিকার আইন প্রণয়নের উদ্যোগটি একটি শুভ পদক্ষেপ। প্রস্তাবিত খসড়াটি সম্পর্কে জনমত গ্রহণের প্রচেষ্টাও নিঃসন্দেহে প্রশংসনীয়। তবে খসড়াটির কতগুলো মৌলিক সমস্যা রয়েছে এবং বর্তমানরূপে এটি অগ্রহণযোগ্য। এর উদ্দেশ্য অস্পষ্ট ও ধোঁয়াটে – এতে তথ্য অধিকারকে মৌলিক অধিকার হিসেবে স্বীকৃতি দেয়া হয় নি। এছাড়াও এর পরিধি – সকল বেসরকারি স্বেচ্ছাসেবী ও ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠানকে প্রস্তাবিত আইনের আওতায় আনা – এটিকে লক্ষ্যচ্যুত করবে বলে অনেকের আশংকা। প্রস্তাবিত আইনটিকে সরকারি ও সরকারি কর্তৃপক্ষের ক্ষেত্রে নিবিষ্ট করাই যুক্তিযুক্ত হবে বলে অনেকে মনে করেন। বেসরকারি স্বেচ্ছাসেবী ও ব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠানগুলোর কার্যক্রম পরিচালনা এবং সেগুলো তদারকির জন্য সুনির্দিষ্ট আইন ও কর্তৃপক্ষ রয়েছে। তবে এ সকল আইনে কর্তৃপক্ষের কাছে তথ্য উন্মুক্তকরণের বিধানগুলোকে আরো কঠোর ও জোরদার এবং তথ্য অধিকার আইনে কর্তৃপক্ষের কাছে সংরক্ষিত তথ্যসমূহ প্রকাশের বাধ্যবাধকতা সৃষ্টি করা আবশ্যক।

তথ্য অধিকার আইন প্রণয়ণের উদ্দেশ্য হওয়া উচিত সীমিত সংখ্যক এবং কিছু সুনির্দিষ্ট ও সুস্পষ্ট বিধি-নিষেধ ছাড়া তথ্যপ্রবাহকে অবাধ করা – তথ্য উন্মুক্তকরণকে 'এক্সেপশনে'র পরিবর্তে 'রুল' বা নিয়মে পরিণত করা। কিন্তু জনস্বার্থ, রাষ্ট্রীয় সম্মান ও রাষ্ট্রীয় নিরাপত্তার অজুহাতে – প্রস্তাবিত খসড়াটি আইনে পরিণত হলে – তথ্য প্রবাহ পুরোপুরি বিঘ্নিত করা সম্ভব হবে। তাই জনস্বার্থ ও রাষ্ট্রীয় সম্মান বা ভাবমূর্তির বিষয়গুলো আইনের অব্যাহতির তালিকা থেকে বাদ দেয়া উচিত। রাষ্ট্রীয় নিরাপত্তার সংজ্ঞাও সংকুচিত করা প্রয়োজন, যাতে প্রতিরক্ষা ক্রয় ও ক্রয়ের ক্ষেত্রে ঠিকাদারিত্বের বিষয়টি তথ্য অধিকার আইনের আওতায় আসে। এছাড়াও তথ্য প্রবাহ অবাধ করার লক্ষ্যে চূড়ান্ত আইনে স্বপ্রণোদিত হয়ে তথ্য উন্মুক্তকরণ এবং কম্পিউটার ও আধুনিক তথ্য প্রযুক্তি ব্যবহার এবং ই-গভর্নেন্সের ওপর গুরুত্বারোপ করা প্রয়োজন। তাহলেই বিরাজমান তথ্য গোপনের সংস্কৃতির রূপান্তরের সম্ভাবনার দ্বার উন্মোচিত হবে। এ লক্ষ্যে আরো প্রয়োজন 'অফিসিয়াল সিক্রেটস অ্যাক্টে'র মতো আইনের সংশোধন।

তথ্য কমিশন গঠনের পদ্ধতি এবং এ সদস্য সংখ্যা নির্ধারণের ক্ষেত্রে নতুন করে ভাবার প্রয়োজন রয়েছে। তথ্য কমিশনকে অবশ্যই তথ্য গোপনের সংস্কৃতি ভাঙ্গার এবং তথ্য উন্মুক্তকরণের প্রবক্তা হতে হবে। কমিশনের ওপর চাপ লাঘবের লক্ষ্যে প্রত্যেক কর্তৃপক্ষের সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে প্রাথমিকভাবে আপিল করার জন্য প্রস্তাবিত আইনে আরবিট্রেশনের বিধান রাখা প্রয়োজন হবে। এছাড়াও কমিশনের কাছে আপিলের দায় আবেদনকারীর পরিবর্তে তথ্যপ্রদানে অস্বীকৃতি জানিয়েছে এমন কর্তৃপক্ষের ওপর বর্তানো যেতে পারে – তা হলেই প্রস্তাবিত আইনের সুফল সাধারণ জনগণের কাছে পৌঁছার এবং বিরাজমান গোপনীয়তার সংস্কৃতির রূপান্তরের পথ সুপ্রশস্ত হবে।

আমরা আশা করি যে, যে সকল সুপারিশ ইতোমধ্যে প্রদান করা হয়েছে এবং একটি নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে অন্য যে সকল সুপারিশ আসবে তার আলোকে তথ্য অধিকার আইনের একটি নতুন খসড়া তৈরি করে তা আইনে পরিণত করা হবে। জনগণের তথ্য অধিকার নিশ্চিত করার জন্য আমরা একটি যথাযথ আইন চাই। প্রক্রিয়াটি শুরু করার জন্য তথ্য মন্ত্রণালয়কে ধন্যবাদ।